দৈনিক ইনকিলাব ০৪৪
তারিখ 2 4 DEC-1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১
৬ দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ছাত্ররা ভুল পড়ে ভুল শিখে পরীক্ষার খাতায় ভুল লিখে আসে

এম. আবু তাহের

প্রায় প্রবাদ বাক্যের মত চলে আসছে, এক যাত্রায় ফল লাভ একটাই। কিন্তু এক যাত্রায় দুই রকম ফল এ কথা শুনছে কেও কখনও? আমাদের দেশে ছাত্ররা পরীক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু দুই রকম ফল লাভ করে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা এস এস সি, এইচ এস সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা সবক্ষেত্রেই দেখা যায় কেউ পাস করছে, কেউ করছে ফেল। এবারের বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল কিন্তু একটু উন্নত ধরনের। পাসের হার একটু বেশি। সবক'টা বোর্ডের পরীক্ষার পাসের হার মোটামুটি রকম ভাল কিন্তু একে কি সন্তোষজনক বলা যায় না, কোনক্রমেই নয়। শতকরা ষাট-পঁয়ষট্টি ভাগ পাসের হার এটা কোনক্রমেই সন্তোষজনক বলা যায়? না, কোনক্রমেই নয় শতকরা ষাট-পঁয়ষট্টি ভাগ পাসের হার এটা কোনক্রমেই সন্তোষজনক নয় বরং একে বলা চলে নৈরাশ্যজনক। বছরের পর বছর পড়াশুনা করে, খাটাখাটুনি করে পিতা-মাতার কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করতে কেউ চায় না। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকসংখ্যক ছাত্রের ভাগ্যেই জোটে ফেল। এটা শুধু যে ফেল করলো তার জন্যই দুর্ভাগ্যজনক নয়, যারা এত কষ্ট করে টাকা-পয়সার জোগান দিলেন তাদের জন্যও নৈরাশ্যজনক।

কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? যে ছাত্র বা ছাত্রী ফেল করলো সেই কি একমাত্র দায়ী? না, তা নয়। দায়ী শিক্ষক সম্প্রদায়। যারা এতদিন পরিশ্রম করে তাকে পাঠ দান করলেন, যে শ্রম দিলেন, তা একেবারে পণ্ড হলো। দায়ী মাতা-পিতা যারা দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলেন। দায়ী পরিবেশ। আর ক্ষতি হলো সারা দেশের। এ ক্ষতি অপূরণীয়। শিক্ষা দান নির্ভর করে কয়েকটি উপাদানের ওপর। এর মধ্যে প্রধান হলো ছাত্র-শিক্ষক, পিতা-মাতা, স্কুল এবং পরিবেশ। পাঠ্য-পুস্তকের ভূমিকাও কম নয়। যে পুস্তক ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারে না তা ছাত্ররা পড়ে না। সুতরাং পরীক্ষায় তারা নম্বর পায় না কি করে? বইয়ের তথ্যগুলো এরূপভাবে পরিবেশন করতে হবে যেন, সেগুলো গল্পের মত সুপাঠ্য হয়। বাজারের নিকৃষ্টমানের কাগজ ও কালি ব্যবহৃত হয় পাঠ্য-পুস্তকে। মুদ্রণ হয় ঝাপসা-ঝাপসা, যা খুব সহজে পড়া যায় না। পরীক্ষার সময় শুধু পাস করার জন্য ছাত্ররা দিন কয়েক নোট বই পড়ে বা মোটে পড়ার উপযুক্ত নয়। একে বানান ভুল, বাক্য গঠনে ভুল, ব্যাকরণ ভুলেরত কথাই নেই। আর আছে ছাপার ভুল। এই সব ভুল পড়ে পরীক্ষায় কি নম্বর পাওয়া যায়? ইদানীং আইন করে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের অর্থ পুস্তক প্রণয়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার পরিবর্তে পাঠ্য-পুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়েছে কিন্তু কঠিন শব্দের অর্থ আর শিক্ষকের প্রতি কিছু নির্দেশনা যা দেখে ছাত্রদের তিনি পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা দেবেন। এখানে উল্লেখ্য, পাঠ্য-পুস্তকেও বানান ও নানা প্রকারের ভুলের কমতি নেই, এ সব ভুলের সংশোধন করা তো হয়ই না তার পরিবর্তে প্রত্যেক বছর পাঠ্য-পুস্তক পরিবর্তন করা হয় যার ভেতর থাকে আরও বেশি পরিমাণ ভুল। সুতরাং ছাত্ররা ভুল পড়ে, ভুল শিখে ও পরীক্ষার খাতায় ভুল লিখে আসে।

শিক্ষকের কাজ হলো পাঠ দান করা। পাঠ্য বিষয় সহজ করে তোলা। নানা ধরনের রসাত্মক গল্প করে ছাত্রের মন শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা। এটা সুনিশ্চিত যে, জোর করে কিছু শেখানো যায় না। ছাত্ররাও শিখতে পারে না। তাদের শিখতে হয়। এখানেই শিক্ষকের ভূমিকা সার্থক। যদি তিনি ছাত্রকে বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন, যদি তাকে প্রকৃতিভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তবেই তিনি আদর্শ শিক্ষক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে তা করা হয় না। ক্লাশে ঢুকে বই খুলে শুধু বলেন, পরের দিন এই খান থেকে এই পর্যন্ত পড়া শিখে আসবে। এর পর তিনি চেয়ারে বসে ঝিমুতে থাকেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিটি ছাত্রের উপর নজর রাখতে হয় শিক্ষকের। এ জন্য ক্লাশের ছাত্র সংখ্যা রাখতে হয় সীমিত। অধিক ছাত্র হলে প্রতিটি ছাত্রের প্রতি নজর রাখা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। ছাত্রের বাড়ীর কাজ দেখাও সম্ভব নয়। কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা যখন দিন দিন বাড়তে লাগলো। তখন কর্তৃপক্ষ একটা বড় ভুল করলেন। স্কুলের সংখ্যা বা শ্রেণীর শাখা না বাড়িয়ে ছাত্রের সংখ্যা সীমিত করে দিলেন ত্রিশ। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে করা হলো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। এতেও এখন কুলোয় না। দু-একজন এমন ছাত্র আসে যাদের না নিয়ে পারা যায় না। দু-একজন ছাত্রের জন্য ভিন্ন একটি শাখাও খোলা যায় না। দায়ে পড়লে বাঘে ঘাস খায়। এ অবস্থায় তাই তাদের নিতে হয়।

কাম্পুচিয়ার একটি স্কুল

বেসরকারী স্কুলের কিন্তু ভিন্ন অবস্থা। সেখানে ছাত্র ভর্তির কোন সীমা নেই। ষাট, সত্তর, আশি অনেক সময় এরও বেশী। ক্লাশে জায়গা হোক বা না হোক, বসার জায়গা থাকুক না থাকুক ছাত্র ভর্তি করতেই হবে।

এই যে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হলো, শ্রেণীকক্ষে তাদের বসার জায়গা নেই, চেয়ার বেঞ্চি নেই, এদের মধ্যে যাদের পড়ার আগ্রহ আছে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে সারা দিন দাঁড়িয়ে কাটায়। আর যাদের পড়াশুনায় আগ্রহ নেই তারা শ্রেণীর অবস্থা দেখে 'কেটে পড়ে'। সারা দিন এখানে-ওখানে কাটায়, নানা রকম অসামাজিক দলে যোগ দেয়।

শ্রেণীকক্ষে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হলো গৃহ শিক্ষকতা আর কোচিং ক্লাশের ব্যবস্থা। বাড়ীতে একা গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে হলে দক্ষিণা দিতে হয় কম করে ৫শ' টাকা। দুই বা তিনজন মিলে পড়তে হলে তিন শ' করে দিলে চলে। স্কুলে কোচিং ক্লাশে পড়তে গেলে দিতে হয় দেড়শ' করে। অনেক সময় কোচিং ক্লাশে যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। শুধু স্কুলে গেলেই হয় না, শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব আছে তো। তাকে ছাত্র পাশ করাতে হবে। তাই কিছু উপরি পাওনা আদায় করেন।

অনেক সময় দেখা যায় গৃহ শিক্ষক না রাখতে চাইলে বা টিউটোরিয়াল ক্লাশে যোগ দিতে না চাইলে ছাত্রদের বাধ্য করা হয় কারণ, খেলার বলত টিচারের কোটে। তিনি ক্লাশের পরীক্ষায় সে ছাত্রকে ফেল করিয়ে দেন। ফলে বাধ্য হয়ে ছাত্রদের গৃহ শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হয় বা কোচিং ক্লাশে যোগ দিতে হয়।

চল্লিশের দশক এবং তার পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন ছিল। তখন ছিল সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা। কলেজে ছিল টিউটোরিয়াল ক্লাশ। টিউটোরিয়াল ক্লাশ প্রতি বিষয় সপ্তাহে একদিন করে অনুষ্ঠিত হতো। এতে করে অধীত বিষয়সমূহ ভাল করে পড়ার সুযোগ হতো।

এসব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ছাত্রদের পরীক্ষা সম্পর্কে মনের ভয়-ভীতি কেটে যেত। তারা পরীক্ষা দেয়াকে সহজভাবেই গ্রহণ করতো। তাদের নকল করার প্রবৃত্তিও হতো না।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জিনিসপত্রের দাম হলো আকাশচুম্বী। কাগজ হলো দুর্মূল্য। অনেক সময় বাজারে কাগজ পাওয়া যেতো না। অনন্য জিনিসপত্রের দামও বাড়লো এ অবস্থায় এত ঘন ঘন পরীক্ষা নেয়া হলো অসুবিধা। তখন পরীক্ষা গ্রহণ বস্তুটি স্কুল কলেজ থেকে অন্তর্হিত হলো। আবার এদিকে বাজারে সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিক্রয়ের জন্য প্রচলিত হলো কন্ট্রোল পদ্ধতি। বিশেষ করে চাল, চিনি, আটা, কেরোসিন ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া জন্য হলো কন্ট্রোল ব্যবস্থা। দোকানের সামনে 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে এসব দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হতো। এসব দ্রব্য যত দুর্মূল্য হতে লাগলো 'কিউ' হতে লাগলো তত বড়। এতে সময় লাগতো অনেক। পিতা-মাতা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত। সুতরাং এসব সংগ্রহের জন্য বাড়ীর ছেলে-মেয়েদেরই প্রস্তুত হতে হতো। এ জন্য তারা স্কুল-কলেজের পড়া তৈরী করার সময় পেত কম। এদিকে কাগজ-কালি দুর্মূল্য। পাওয়াই যায় না বাজারে। অতএব সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও কলেজের ত্রৈমাসিক পরীক্ষাগুলো তুলে দেয়া হলো। রইলো শুধু বার্ষিক পরীক্ষা, যা না হলেই নয়। ছেলে-মেয়েরা কিউতে দাঁড়িয়েই কুল পায় না। পড়বে কখন? পড়াশুনা মাথায় ওঠলো। সুতরাং পরীক্ষা পাসে সোজা পথ বের করতে হলো তাদের। বই না পড়ে অর্থ পুস্তকের সাহায্য নিল অধিকাংশ ছাত্র। অনেকে আবার সে পথও ধরলো না। তারা করলো অন্য ব্যবস্থা। স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ভাল ছেলেদের শরণাপন্ন হলো। তাদের ধরে এনে নকলের গোপন কারখানা খোলা হলো। পরীক্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথে সেখানে এসে হাজির হতো প্রশ্নপত্র ও খাতা। সেখানেই তাদের দিয়ে লেখানো হতো আসল খাতা। আসল পরীক্ষার্থী অন্য একটি খাতায় আজে-বাজে লেখা দিয়ে খাতা ভরে তুলতো। আসল খাতা লেখা শেষ হলে এক সময় সুযোগ বুঝে গিয়ে হাজির হতো আসল 'জায়গায়। নেকীখাতা খানি সময় বুঝে জায়গা নিত পকেটে।

এখন অবশ্য অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে। পরীক্ষায় নানারকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে নকল প্রবণতা কিছু কমে এসেছে। অধুনা একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে ঢাকা শহরের স্কুলসমূহের ও মফস্বল শহরের স্কুলসমূহের একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানো হয়েছে, ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ প্রভৃতি কলেজের পরীক্ষায় পাসের হার তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু স্ট্যাণ্ড করা ছেলে-মেয়ের সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাসের হার এ সব কলেজে বেশী। আবার মফস্বল কলেজগুলোতে তৃতীয় শ্রেণীতে পাসের হার খুব বেশী। পরীক্ষার আগে ঢাকা শহরের কলেজগুলো থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে মফস্বল কলেজে ভর্তি হওয়ার হার খুব বেড়ে গেছে। এখানে নকল করার প্রবণতা এখনও খুব বেশী। বলতে গেলে অবাধ। এখানে এসে পরীক্ষা দিয়ে তারা পাস করে অবশ্য তৃতীয় বিভাগে।

আদর্শ প্রশ্নপত্র কিরূপ হওয়া দরকার সে বিষয়ে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন ক্লাশে যত ছাত্র থাকে তাদের অধিকাংশ সাধারণ মানের। আবার কিছুসংখ্যক ছাত্র থাকে তারা মধ্যমমানের। মেধাবী ও পরিশ্রম করে যারা পড়াশুনা করে তাদের সংখ্যা মাত্র কয়েকজন। সুতরাং প্রশ্নপত্র তৈরীর সময় এই তিন ধরনের ছাত্রের কথা মনে রাখতে হবে। এক অংশ এমনভাবে তৈরী করতে হবে যার উত্তর সব ছাত্রের পক্ষে দেয়া সম্ভব। দেখতে হবে সব ছেলে অন্ততঃ পাস নম্বর যাতে পায়। আর এক অংশ এমন হবে যেন মধ্যমমানের এবং সেরা ছাত্ররা জবাব দিতে পারে। আর এক অংশ হবে বেশ কঠিন যার উত্তর শুধু মাত্র মেধাবী ও সেরা ছাত্ররাই দিতে পারবে। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষায় ফেল কার জন্য কোন প্রকার সম্মান বহন করে না। ব্যর্থতা তাদের নিজেদের জন্যও বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর। যত বেশী সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় পাস করবে দেশের তত বেশী মংগল। শুধু ছাত্রের নিজের জন্য নয়, সবার জন্য। একথা মনে রেখে প্রশ্নপত্র তৈরী করলে ফেল করবে মাত্র গুটি কয়েক। আরও মনে রাখতে হবে, আমরা স্কুলে লেখাপড়া শিখতে যাই পাস করার জন্য, ফেল করতে নয়। ফেল করা কারোও মনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যত অধিকসংখ্যক ছাত্র পাস করবে, ছাত্রগণও তত বেশী উৎসাহ পাবে। তাদের মনের আশা বেড়ে যাবে। জাতির জন্য তারা বয়ে আনবে গৌরব।

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এখানে সেকেলে। বহু বছর পূর্বে শিক্ষার যেধারা প্রচলিত ছিল এখনও আমরা সে ধারাকেই আঁকড়ে আছি। অন্যান্য বিষয়ের মত শিক্ষা ধারারও যে পরিবর্তন আবশ্যক আমরা তা বুঝতে চাইনে। কিন্তু দুনিয়াত আমাদের জন্য বসে থাকছে না। সে প্রতিদিন বদলাচ্ছে।

আমাদের সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং সে অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রস্তাব রাখার জন্য অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে সরকার একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। রিপোর্টটি এখন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। রিপোর্টে কিছু যুগান্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।